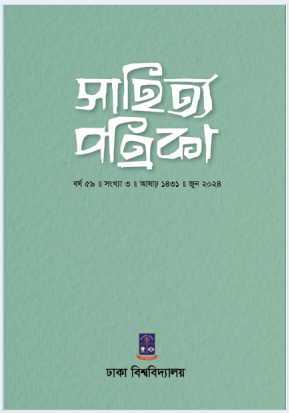

Vol. 59 | No. 3 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

‘একুশের উপন্যাস’: ইতিহাস ও শিল্পের বোঝাপড়া

Volume	59
Issue	3
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Rafat Alam
Published online	April 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v59i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i3.6
Pages	113-132
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩১॥ জুন ২০২৪
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v59i3.6
প্রবন্ধ জমাদান: ১০ এপ্রিল ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১১৩-১৩২

‘একুশের উপন্যাস’: ইতিহাস ও শিল্পের বোঝাপড়া

মো. রাফাত আলম মিশু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: rafat@du.ac.bd

সারসংক্ষেপ

উপন্যাসের রাজনৈতিক বয়ান একটি কালের বিচিত্র মাত্রাকে পাঠ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। উপন্যাস ইতিহাসের সংবাদপত্রীয় বিবরণমাত্র নয়; উপন্যাস কেবল গল্প আর কাহিনি-নির্ভর শিল্পমাধ্যম বলেও বিবেচিত হয় না। ব্যক্তির সমস্যা যেমন বহুবিচিত্র, উপন্যাসের আওতাও তাই বহুমাত্রিক। একটি বিশেষ কালে, বিশেষ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে সৃষ্টিশীল মানুষের চেতনা ও সৃজনকর্ম মূলত ইতিহাসেরই সৃষ্টি। ১৯৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মতো বড় ঘটনা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক পাঠ ওই কালপর্বের ইতিহাসের পাঠকে সামূহিক ও সম্পূর্ণ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিল্প-রূপকল্প হিসেবে উপন্যাসের বয়ান একটি জনজাতির মহাবয়ানের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ইতিহাসের অনিবার্য উপাদান হিসেবে সামাজিক-অর্থনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ উপস্থিত থাকে উপন্যাসে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী বয়ানে ‘একুশের চেতনা’ বিবেচিত হয় একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকগণ তাঁদের করণকৌশলের সক্ষমতা অনুযায়ী কীভাবে এই চেতনাকে রূপদান করেছেন উপন্যাসের আধারে, তার অন্বেষণ-চেষ্টা আছে বর্তমান প্রবন্ধে।

মূলশব্দ

বাংলাদেশের সাহিত্য, নব্য ইতিহাসবাদ, উপন্যাস বিচার, রাজনৈতিক উপন্যাস, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, একুশের চেতনা, জহির রায়হান।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে এর শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ববাংলা এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাল-পরিসরে রচিত বাংলা ভাষার সাহিত্যকে নির্দেশ করা হচ্ছে। রাজনীতির অনুষঙ্গে আবহমান বাংলা সাহিত্যের ধারায় ১৯৪৭ একটি বড় বাঁক-বদলের সন্ধিক্ষণ। এর পরই একই ভাষাভাষী দুই অঞ্চলের জীবনায়ন, রাজনীতি, সামাজিক পরিস্থিতি আনুষ্ঠানিকভাবে ও অনিবার্যভাবে দুই ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলাদেশের সাহিত্যও সেই স্বতন্ত্র জীবনায়নের অনুগামী, যে ধারা ১৯৭১ সালের পরেও ভিন্নগামী হয়নি, বরং চেতনাগত ওঠানামা সত্ত্বেও তা সাতচল্লিশ-পরবর্তী পারম্পর্য রক্ষা করেছে। পূর্ববাংলার জীবনায়নের ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্যের কথা বলা হচ্ছে, তার প্রথম অনুষঙ্গ হচ্ছে ভাষা আন্দোলন—রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন—একুশের চেতনা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একুশের চেতনা একটি দিক-নির্ণায়ক অনুষঙ্গ। ভাষা আন্দোলনই বাংলাদেশের মানুষের প্রথম সচেতন রাজনৈতিক ও নাগরিক আন্দোলন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের মূলধারার বয়ান এখন সর্বজনজ্ঞাত। এখনও এই আন্দোলন-সংক্রান্ত নতুন নতুন বিশ্লেষণ, সূত্র ও তথ্য নতুন নতুন তত্ত্বায়নে সবিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আমরা সবাই জানি—রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একদিনে গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের সূত্রপাত আরো আগে। ১৯৪৭ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা করার তৎপরতা শুরু হলে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭), সৈয়দ মুজতবা আলীসহ (১৯০৪-১৯৭৪) আরো অনেকে লিখিতভাবে—প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, সম্পাদকীয়তে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে নিজেদের অবস্থান ও যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁদের এই ধরনের তৎপরতার মূল্য আছে। কিন্তু এইসব পদক্ষেপকে ঠিক সাহিত্যিক পদক্ষেপ বলা যায় না। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার বছর ব্যাপী একটি আন্দোলন বিভিন্ন গতিতে বিরাজমান থাকলেও সৃষ্টিশীল সাহিত্য-পরিমণ্ডলে এর প্রভাব বা অভিঘাত কেমন, এর উত্তর-সন্ধান আমাদের ভিন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি করে। হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) তাঁর *ভাষা-আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি* (১৯৯০) বইয়ে জানান:

> [পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে] এ-সময়ের কবিদের অধিকাংশই রচনা করেছেন পাকিস্তান, কায়েদে আজম, কায়েদে মিল্লাত ও শায়েরে পাকিস্তান বা ইকবালের স্তোত্র, ঈদের ও আজাদীর মহিমা বর্ণনা করেছেন তাঁরা বছরের পর বছর; এবং প্রকাশ করেছেন শিল্পগুণহীন আবেগ-উচ্ছ্বাস-উল্লাস-ক্ষোভ। (হুমায়ুন ২০১৪: ২৮)

এমন পাকিস্তানবাদের ভরামৌসুমে বিদ্বৎ-মহলে উত্থাপিত হয় রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ। বাঙালি মনস্তত্ত্বে তখনও পাকিস্তানের প্রতি ছিল গভীর দুর্বলতা। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে ধর্মীয় প্রভাব জনমনস্তত্ত্বে বিরাজমান থাকাটাও অস্বাভাবিক ছিল না।

বাংলাদেশের সাহিত্য পর্যালোচনাসূত্রে এ কথা বলা যায়, সাহিত্য এই জনাঞ্চলের রাজনীতিকে কমই প্রভাবিত করেছে। বরং আমাদের সৃজনশীল সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনায়

হয়েছেন রাজনৈতিক ঘটনা ও তৎপরতার অনুগামী। এ কথা চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলন, চল্লিশের দশকের শেষ থেকে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বলা যায়। আমাদের বর্তমান আলোচনার আওতা বাংলাদেশের উপন্যাসে ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উপস্থাপনার ধরন, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিরীক্ষণ এবং সেই সূত্রে ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের বোঝাপড়া অনুধাবন। প্রথমেই বলে রাখা দরকার, ১৯৪৭-১৯৫২ এই সাড়ে চার বছরের কাল-পরিসরে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক ঘটনা বা তৎপরতা নিয়ে কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। শুধু উপন্যাস কেন, হুমায়ুন আজাদ বিস্তারিতই বলেছেন, অপরাপর সাহিত্যকর্মের মধ্যেও এর প্রভাব তেমন দেখা যায় না। এমনকি আবদুর রশীদ খান (১৯২৪-২০১৯) ও আশরাফ সিদ্দিকীর (১৯২৭-২০২০) সম্পাদনায় ১৯৫০ সালে প্রকাশিত সমাদৃত কবিতাসংকলন *নতুন কবিতার* মধ্যেও প্রত্যক্ষত ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ নেই। যদিও ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত পরে এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্যকর্ম বিশেষত কবিতা, গান, গল্প রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সেসবের একটি দৃশ্যমান ও সাহিত্যিক দলিল হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* (১৯৫৩) সংকলন।

ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে উপন্যাস রচিত হয়েছে আরো পরে। এই প্রসঙ্গে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কীভাবে উপন্যাস রচনার অনিবার্যতা তৈরি হয়, সেই বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের অপরাপর সাহিত্যধারার মতো উপন্যাসের সম্পর্কও সমান্তরাল। ইতিহাস ও রাজনীতির পাঠের মতো উপন্যাসও তৈরি করে একটি জনাঞ্চলের পাঠ ও পাঠান্তর। শিল্প হিসেবে উপন্যাস অনেক বেশি দেশ-কাল ও সমাজ-সাপেক্ষ। 'উপন্যাসে কালিক ও দেশিক সঙ্কল্প অবিচ্ছিন্ন, তাদের উদ্ভাসে আবেগ ও মূল্যবোধ দুইই কাজ করে। বিমূর্তভাবে দেশ ও কালকে পৃথক সত্তা হিসাবে দেখা গেলেও, জীবন্ত প্রাণময় শিল্প-বীক্ষায় এ ধরনের বিভাজন সম্ভব নয়' (পার্থপ্রতিম ১৯৯৪: ৯)। বাংলাদেশের উপন্যাসে বিশেষত যেখানে রাজনৈতিক ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত, সেখানে এই বিবেচনাটি বিশেষভাবে কার্যকর। বাংলাদেশ তার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক পথ অতিক্রম করে যখন উপস্থিত হয় চল্লিশের দশকে, তখন এই জনাঞ্চলে তৈরি হয় ইতিহাসের স্বতন্ত্র পাঠ। উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য:

> শিল্পবিপ্লবোত্তর কালের নাগরিক, যান্ত্রিক ও কৃত্রিম মধ্যবিত্তমানসের শিল্পচাহিদারই প্রকাশরূপ হলো উপন্যাস। সভ্যতার মধ্য যুগ থেকে আধুনিকতায় উত্তরণের স্বভাবধর্মকে ফ্রেডরিক এঙ্গেল বলেছিলেন Negation of the Negation অর্থাৎ নেতির নেতিকরণ। মানুষের নন্দনতাত্ত্বিক অভ্যাসের জগতে উপন্যাসের জন্মও অনেকটা সেইভাবে। সহজ কথায়, বুর্জোয়া তস্করের শিল্পচাহিদার অপর নাম উপন্যাস। (রফিকউল্লাহ ২০১১: ১৯-২০)

একই সঙ্গে উপন্যাস রচনার পেছনে যে বিষয়টি ক্রিয়াশীল থাকে, তা হলো ব্যক্তির জীবনসংকট রূপায়ণ সূত্রে একটি কালের একটি জনগোষ্ঠীর সামূহিক জীবন-জিজ্ঞাসার উন্মোচন। 'ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর সময় ও ইতিহাস, নিজ অভিজ্ঞতা ও জীবনের

মধ্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটিকে একটি টেকসট বা বয়ানে আকরিত করেন' (পার্থপ্রতিম ১৯৯১: ১১)। উপন্যাস ও ইতিহাসের সম্পর্ক বিষয়ে আরো উল্লেখ্য:

> ইতিহাসের উপাদান নিয়ে সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করতে হলে অনিবার্য হয়ে ওঠে ইতিহাস ও উপন্যাসের মধ্যে একটি গভীর ভারসাম্য স্থাপনের। ইতিহাস ও উপন্যাস—এ দুয়ের একটি যাতে আরেকটিকে অতিক্রম করে না যায় সেদিকে জরুরি হয়ে পড়ে ঔপন্যাসিকের সতর্ক দৃষ্টিপাতের। উপন্যাসের বাস্তবতা ও ইতিহাসের বাস্তবতা দুয়েরই রাশ টেনে না ধরলে ব্যাহত হতে পারে উপন্যাসের শিল্পগত সফলতা। (সৈয়দ আজিজুল ২০২০: ৩৮২)

বায়ান্ন-পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের চেতনা নিয়ে কবিতা ফলবান হয়ে উঠলেও কথাসাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে তার প্রভাব ক্ষীণ। এর কারণ কী হতে পারে? বায়ান্ন সংঘটিত হলেও 'নাগরিক মধ্যবিত্ত' কি তখনও দানা বেঁধে ওঠেনি? যথাযথ শিল্প-কারখানা বিকশিত হয়নি? নাকি সামূহিক জীবনচেতনায় তখন পর্যন্ত পাকিস্তানি মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল? এ কারণেই কি বায়ান্ন ঘটে যাবার পরেও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ নিয়ে রচিত হয় আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) *জীবন-ক্ষুধার* (১৯৫৫) মতো উপন্যাস কিংবা সরদার জয়েনউদ্‌দীনের (১৯১৮-১৯৮৬) *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৭)? নাকি ষাটের দশকের আইয়ুবি কালো দশকের বাস্তবতা অপরাপর সকল শ্রেণির মতো সৃজনশীল সাহিত্যিকদের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করেছিল? তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা গ্রহণ করে থাকি শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *ক্রীতদাসের হাসি*কে (১৯৬২)। ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রথম উপন্যাস বলা যায় জহির রায়হানের (১৯৩৫-১৯৭২) *আরেক ফাল্গুন*কে (১৯৬৯)। কিন্তু *আরেক ফাল্গুনে*র রচনাকাল আমাদের আরো একটি বিষয়ে ভাবিত করবে, এটি কি ভাষা আন্দোলনের উপন্যাস নাকি উনসত্তরের গণঅভুত্থানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গজাত উপন্যাস? অথবা আরো একটি সূত্র এখানে উপস্থাপন করা যায়, তা হলো—ভাষা আন্দোলনের পর থেকে উনসত্তর, বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই দুই বড় রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে উপন্যাস-সাহিত্যে যে সমকালীনতার শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, জহির রায়হান সেই শূন্যতা মোচনে দায়বদ্ধ শিল্পীর ভূমিকা পালন করেছেন; দুই দিক-নির্ণয়ী অনুষঙ্গের মধ্যে অভিন্ন রাজনৈতিক চেতনার সংযোগ স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য ও রাজনীতির গতিপথ যে সমান্তরাল, জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে ভাষা আন্দোলন তথা একুশের চেতনার সজীব উপস্থিতির মধ্য দিয়ে সেই সত্যের অভিযাত্রাটি সূচিত হয়। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় 'একুশের উপন্যাস' শীর্ষক একটি সংকলন। এই সংকলনে তিনটি উপন্যাস অন্তর্ভুক্ত হয়: শওকত ওসমানের *আর্তনাদ*, জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* এবং সেলিনা হোসেনের (জ. ১৯৪৭) *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি*। এই সংকলনভুক্ত উপন্যাসত্রয় বর্তমান আলোচনায় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এক

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ফাল্গুনে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনে বাঙালি ছাত্র-জনতার সামবায়িক প্রতিবাদী অংশগ্রহণ ও অবস্থান জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের দৃশ্যমান পটভূমি। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির

রক্তোজ্জ্বল চেতনাই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি। কিন্তু উপন্যাসের শুরুটা যখন হয় ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্ণনায়, যে ভিক্টোরিয়া পার্ক একসময় ছিল আন্ডারগোরার ময়দান, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে অংশ নেবার অভিযোগে যেখানে নিরস্ত্র সিপাহিদের ফাঁসি দিয়ে গাছের ডালে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তখন তা হয়ে ওঠে একুশের চেতনার সুদূর উৎসানুসন্ধানী। একই সঙ্গে উপন্যাসের প্রকাশকাল, ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক বোধি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সংরক্ত হয় উপন্যাসের শিল্পশরীরে। এমন সময়ে এবং এমন সময়কে নিয়ে রচিত হয় *আরেক ফাল্গুন*, যা রাষ্ট্রের সঙ্গে জনতার সম্পর্কসূত্রের চিরায়ত স্বরূপকে উন্মোচন করে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের উত্তুঙ্গ কালে সামরিক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে একুশকে নিয়ে লেখা একটি উপন্যাস সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে সাহসী উচ্চারণ:

> ষাটের দশকের সামরিক শাসনপীড়িত পরাধীন বাংলাদেশে একজন শিল্পীর চৈতন্যে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামী প্রেরণা কতোটা জীবন্ত রূপ ধারণ করতে পারে, জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯) তার প্রমাণ। শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছিলো যে নবসম্ভাবনার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে, *আরেক ফাল্গুন* সেই চেতনারই ধারাবাহিক প্রাগ্রসর সৃষ্টি। (রফিকউল্লাহ ২০০৯: ১৮৬)

বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারণার উৎসবিন্দু যদি বায়ান্নর একুশকে ধরা হয়, তাহলে উনসত্তরের ফেব্রুয়ারিকে বলা যায় সেই ধারণার শীর্ষবিন্দু। উনসত্তরের শিখরস্পর্শী ও মীমাংসিত জাতীয়তাবাদী ধারণার চূড়ান্ত ফলাফল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু বায়ান্ন থেকে উনসত্তর বা একাত্তর পর্যন্ত বাঙালির চলার পথ কোনো অর্থেই মসৃণ ছিল না। বাঙালির বাঙালি হয়ে ওঠা, রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন মোকাবিলা করে সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে কাজ করেছে তার গভীরতর ইতিহাস-চেতনা ও সমকালীন অর্থনৈতিক বিন্যাস। *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে পাঠক সেই ইতিহাস-চেতনার পরিক্রমণকে অনুভব করতে পারে, যা ১৮৫৭ বা তারও আগে থেকে বায়ান্ন, ১৯৫৫, উনসত্তর ও একাত্তরের পথ বেয়ে বর্তমান পর্যন্ত সঞ্চারিত। 'উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় দেখা গেল জহির রায়হান যুগপৎ আন্তর্জাতিক এবং জাতীয়তাবাদী' (আরজুমন্দ ২০০৮: ১৮৮)। জহির রায়হানের জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে তাই মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সুনির্দিষ্টকৃত বাঙালি জাতীয়তাবাদ দিয়ে শনাক্ত করা যায় না। তাঁর জাতীয়তাবাদী অবস্থানকে শোষকশক্তির বিরুদ্ধে বঞ্চিত জাতির নিত্য প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও অধিকার আদায়ের লড়াই-চেতনার মধ্য দিয়ে বহুমাত্রিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই উপন্যাসে দেখা যায় উঠতি শহর ঢাকার একদল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীর সাহসী, সচেতন ও সপ্রতিভ অবস্থান। 'জহির রায়হান *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে খুব ঝটিকা কিছু মধ্যবিত্ত চরিত্রকে বায়ান্ন পরবর্তী একটি একুশের সময়কে নির্মাণ করেন' (শহীদ ২০০৩: ৮৬)। আত্মত্যাগের বায়ান্নর পর তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও শহিদ দিবস পালনে শাসকগোষ্ঠীর বাধা, ষড়যন্ত্র, দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জনমানুষের প্রতি তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অবস্থানটি স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া যায়। এর বিপরীতে মুনিম, আসাদ, রাহাত, কবি রসুল, সালমা, নীলা, বেনুরা ওয়ে ওঠে ইতিহাসের সাহসী সন্তান। আবার সময়ের পরিবর্তনে নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়া এক সময়ের 'কবিতা-লেখক' সরকারি গোয়েন্দা বিভাগে চাকরিরত মাহমুদের স্খলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে মিশে থাকা সবুরের গুপ্তচরবৃত্তি,

বৃহত্তর স্বার্থের চেয়ে আত্মস্বার্থসচেতন বজলে হোসেনের গা-বাঁচানো জীবন আলোচ্য কালপর্বের ছবিটাকে পূর্ণ অবয়ব দেয়। পুরো উপন্যাসে চরিত্রদের মধ্যে মুনিম কেন্দ্রে অবস্থান করে। তবে জহির রায়হান মুনিমকে একক গুরুত্ব দিতে চাননি; মুনিমের মধ্যে ব্যক্তি জহির রায়হানের স্পষ্ট উপস্থিতি সত্ত্বেও মুনিমকে নেতায় পরিণত করা হয়নি। বরং সামষ্টিক উচ্চারণই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় স্বর। এবং উপন্যাসের প্রকাশকাল উনসত্তরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে প্রয়োজন ছিল এই সামষ্টিক স্বরের। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

> '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের স্মৃতিকে পাকিস্তানী শাসকচক্র মুছে ফেলবার জন্য যে ভীতির রাজত্ব কায়েম করেছিল, তাকে ছাত্রছাত্রীরা একটা কাগজের টুকরোর মতো ছিঁড়ে ফেলল। ... এই আয়োজনটিকে একটি অগ্রসর বৈপ্লবিক শিক্ষার পরিচয় দিয়েছে। এই আয়োজনের মধ্যে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত কয়েকটি মুখচ্ছবি। এই উৎসর্গীকৃত যৌবনের প্রসারমান গণ্ডীটা একেকটা সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে কীভাবে বড় হতে যাচ্ছে 'আরেক ফাল্গুন' তার আভাস দিয়েছে। (রণেশ ২০১২: ১৪৫)

মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের বাঙালিদের আত্মপরিচয় নির্মাণে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ। বাঙালি মুসলমান না বাঙালি—এই দ্বিধা বাঙালিত্বের মীমাংসায় এক জটিল সমীকরণ। ষাটের দশকে নানা রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র ও পীড়ন মোকাবিলা করার অন্যতম প্রেরণাদায়ী উৎস ছিল বায়ান্নর একুশ। আর যা বাঙালির জন্য প্রেরণার উৎস, তাই পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য ছিল আতঙ্কের কারণ। ফলে একুশ উপলক্ষ্যে পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থান নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র ও অধিকার-সচেতন নাগরিকের একটি সুচিহ্নিত সমীকরণ। তাই *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাস থেকে এবং সমসাময়িক বয়ান থেকে বায়ান্ন-পরবর্তী সময়ে পঞ্চাশের দশকের ঢাকার নাগরিক বা নাগরিক-উন্মুখ তরুণদের মধ্যে এমন কিছু প্রগতিশীল চিত্র, কর্মক্রিয়া ও নৈতিক অবস্থান লক্ষ যায়, যা বিস্ময়কর ও একইসঙ্গে আশাজাগানিয়া। সেই ঔজ্জ্বল্য ষাটের শেষাংশে অগ্নিস্ফুরণ হিসেবে প্রজ্বলিত হয়। বায়ান্নর ফাল্গুন বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এমন কিছু চেতনাকে জারিত করে দেয়, যা মুসলমানিত্বকে ধারণ করেও বাঙালি মধ্যবিত্ত তার শ্রেণিগত স্বার্থরক্ষা ও অর্থনৈতিক বিন্যাসে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একে বলা যায় মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার প্রথম ধাপ। *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে ধর্ম ও রাজনৈতিক বোধের অপূর্ব মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যে মুসলমান বঙ্গসন্তানরা এক সময় প্যান-ইসলামিক ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, রাজনৈতিক গতিধারার পরিবর্তনের ফলে তারাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী শহিদদের স্মরণে রোজা রাখে; সেটা রমজান মাসে না, ফাল্গুন মাসে। এই উপন্যাসে রোজা রাখার তাৎপর্য এইখানে যে, বাংলা মুসলমানের ভাষা কি না তা নিয়েই যখন এক সময় দ্বিধা ছিল, সেখানে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জনকারীদের প্রতি শোক ও প্রতিবাদ হিসেবে মুসলমান তরুণ-তরুণীরা রোজা রাখছে। এই রোজা রাখা যতটা না ধর্মীয়, তার চেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। একুশে ফেব্রুয়ারি-জাত যে চেতনা এই জনাঞ্চলের মানুষকে সামনের দিকে ধাবিত করে, তা হলো ইহলৌকিক চেতনা। এক অর্থে একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির প্রথম সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ঘটনা, যা সম্ভব

হয়েছিল পূর্ববাংলায়। ধর্মীয় বোধকে সঙ্গে করে নিয়েও এই জনাঞ্চলের চিরায়ত লোকায়ত ঐতিহ্যে লালিত মানুষ অধিকার আদায়ে, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে, গণতন্ত্রায়ণে বেশি ক্রিয়াশীল। বাংলার জনমানুষের ধারাবাহিক সংগ্রামে বায়ান্ন-পরিস্রুত এই বোধকে সমালোচক অভিহিত করেছেন নতুন রেনেসাঁস হিসেবে:

> ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি সিনথেসিসে পৌঁছায় এই সংগ্রাম। সৃষ্টি হয় নতুন চেতনা, অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ। এর মধ্য দিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক এক রেনেসাঁসের জন্ম হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে সূচিত হয় নবজাগরণ। (সৈয়দ আজিজুল ২০২২: ৪৬)

বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং এর সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্র ও জনতার স্বার্থ এবং দুইয়ের টানাপোড়েন। রাতারাতি মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা যেভাবে শহিদমিনার গড়ে তোলে, সরকারি বাহিনী (মিলিটারি) তা গুঁড়িয়ে দিলে সেই স্থানটিকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘিরে রাখে এবং গন্ধরাজ ও গাঁদাফুলের চারা লাগিয়ে রাখে—এর মধ্য দিয়ে রাজনীতি-সচেতন সেক্যুলার নাগরিক মানসিকতার প্রকাশ লক্ষণীয়। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সংঘাত নেই। কারণ ধর্মব্যবস্থা বা ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস করেই তারা অধিকার-সচেতন। একইভাবে পঞ্চাশের দশকের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে কালো পতাকা উত্তোলন, কালো ব্যাজ ধারণ, মেয়েদের কালো শাড়ি পরিধান নাগরিক মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। এসব পদক্ষেপ অভিনব ও প্রগতিমুখী। এবং এ সবকিছুই আলোচ্য কালের আর্থ-রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছে। ১৯৫২-র একুশকে ১৯৫৫-তে স্মরণ করার মুহূর্তে সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে মুনিম-আসাদদের শক্তি যৌথায়নের ভেতর দিয়ে গতিলাভ করে। প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে তারা খালি পায়ে হাঁটে; লরিভর্তি পুলিশও তাদের ভীত করতে পারে না। আসাদ যখন উচ্চারণ করে 'আমি যখন একা ছিলাম তখন সত্যি ভীষণ ভয় হচ্ছিল আমার। এখন অবশ্য আর ভয় হচ্ছে না' (জহির ২০১৬: ১১)। তখন তার শক্তির উৎসটি স্পষ্টতই পরিষ্কার হয়ে যায়। এই যৌথশক্তিকে বরং ভয় পায় শোষকগোষ্ঠী। 'ইন্সপেক্টর রশীদের বুকটা কাঁপছিলো ভয়ে। কে জানে ছাত্রদের ব্যাপার, কিছু বলা যায় না' (জহির ২০১৬: ৬২)। সরকারবিরোধী আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী বৃহত্তর গণচেতনায় পরিণত করার পেছনে সবচেয়ে বড় প্রভাবক এই সঙ্ঘচেতনা। এই উপন্যাসের প্রধান স্বর সামষ্টিক স্বর। প্রকাশ্যে মিছিল সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকায় রাতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি ভবনের ছাদ থেকে 'সমস্ত শহর কাঁপিয়ে অযুতকণ্ঠের শ্লোগানের শব্দে চমকে'(জহির ২০১৬: ৪৬) ওঠে সবাই। ঔপন্যাসিক এই অংশের বর্ণনায় তৈরি করেন কোরাসের ইফেক্ট, ধ্বনিগত অনুপ্রাস:

> আকাশে মেঘ নেই। তবু, ঝড়ের সঙ্কেত।
>
> বাতাসে বেগ নেই। তবু, তরঙ্গ সংঘাত।
>
> কণ্ঠে কণ্ঠে আওয়াজ, শহীদের খুন ভুলবো না। বরকতের খুন ভুলবো না। যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। পৃথিবী কাঁপছে। ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে ফেটে পড়েছে দিগ্বিদিক।

> শুধু উত্তর নয়। দক্ষিণ নয়। পূর্ব নয়। পশ্চিম নয়। যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাতে ছাতে, প্রতি ছাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুবক ফেটে পড়ছে চিৎকারে, শহীদ স্মৃতি অমর হোক। (জহির ২০১৬: ৪৭)

জহির রায়হান ফাল্গুনের এই বর্ণনা দিচ্ছেন উনসত্তরের আরো একটি ফাল্গুনে দাঁড়িয়ে, যখন বাঙালি জনগোষ্ঠী তার দ্বিধা কাটিয়ে বাঙালিত্বের শক্তিতে এক হয়ে নতুন এক বিপ্লবের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এই উপন্যাসে শ্রেণির প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই আন্দোলনে মূলত অংশগ্রহণ করে বাঙালির নবোদ্ভিন্ন এক শ্রেণি, যে মধ্যবিত্ত হবার পথে ধাবমান। কিন্তু সকলের অর্থনৈতিক স্তরকাঠামো এক নয়। এক দিকে শাসকগোষ্ঠী, অন্য দিকে সমগ্র 'শোষিত বাঙালি'—এই হিসাবকে বারবার এবং নানাভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন জহির রায়হান। লক্ষণীয়, পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী উপস্থাপনায় বাঙালিত্বের ধারণা শোষিত বাঙালির ধারণায় একাকার হয়ে গেছে। উপন্যাসে পুলিশ অফিসারের মুখ দিয়েই যখন উচ্চারিত হয়, 'লোফার এই খবরের কাগজের হকার বলুন, রিকশাওয়ালা বলুন, এমনকি সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও কেমন একটা সন্দেহের ভাব দেখলাম। আমাদের বিরুদ্ধে কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্র করছে ওরা' (জহির ২০১৬: ৪৮), তখন শাসক-শোষিতের সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে যায়। অন্য দিকে দেখা যায় আন্দোলনের উত্তাল সময়ে লাইব্রেরিতে 'কিছুসংখ্যক ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সেলফ থেকে কয়েকটা বই নামিয়ে সুবোধ বালকের মতো পড়তে বসে গেলো। বাইরে যে অতকিছু ঘটে গেলো যেন ওসবের সাথে কোনো যোগ ছিলো না ওদের' (জহির ২০১৬: ৬৪)। অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা গোয়েন্দা কর্মকর্তা মাহমুদ, বজলে হোসেনের কর্মক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের চারিত্র্য উন্মোচিত হয়। আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী রসুল একজন কবি, আবার বজলে হোসেনও কবি। কিন্তু কবিতে কবিতে কী আশ্চর্য তফাৎ! কবি রসুলের বর্ণনায় বায়ান্নর একুশ হয়ে ওঠে জীবন্ত। রসুল পঞ্চান্নর ফাল্গুনেও গ্রেফতার হয়। আর বজলে হোসেন বলে: 'আমরা হলাম সাহিত্যিক। সমাজের আর দশটা লোক কি শোভাযাত্রা বের করে, পুলিশের লাঠি গুলি খেয়ে প্রাণ দিলে কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমাদের মৃত্যু মানে দেশের প্রতিভার মৃত্যু' (জহির ২০১৬: ৪৩)। যুগে যুগে মুনিম-রসুলদের প্রগতিশীল ন্যায্য আন্দোলনের বিপরীতে এই সুযোগসন্ধানীরাও থাকে তৎপর। উপন্যাসের সমগ্রটা জুড়ে 'আমরা' আর 'ওরা' উচ্চারণে এই দুই পক্ষের ধারণা আরো স্পষ্ট হয়।

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে লক্ষণীয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুষঙ্গগুলো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর মতোই পুরোনো, বৃদ্ধ, গতানুগতিক ও দমন-মনস্ক। যেমন, পুলিশ কর্মকর্তা কিউ খান যে দমননীতি অনুসরণ করে তা যেমন অনুসৃত হয়েছিল ১৮৫৭-র স্বাধীনতা আন্দোলনে, তেমনি বায়ান্নতে, তেমনি উনসত্তরে, এবং পরবর্তীকালেও। এ যেন দমননীতির দুষ্টচক্র, নিপীড়নের পরম্পরা। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দেয়ালে প্রতিবাদী পোস্টার সাঁটাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কিংবা ছাত্র-হলে কালো পতাকা উত্তোলনকে প্রভোস্টের কাছে মনে হয় 'আপদ', বর্তমান সময়েও তার পুনরাবৃত্তি দুর্লক্ষ নয়। জহির রায়হান বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্বর্ণযুগে অবস্থান করেও এ উপন্যাসে কেবল বাঙালিত্বের বোধকে আরোপণমূলকভাবে উপস্থাপন করতে চাননি;

বরং রাষ্ট্র ও জনতার এই চিরায়ত সম্পর্কের ভেতরে বাঙালি জনমানুষের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করেছেন। উগ্র-জাত্যভিমানের বিরুদ্ধেও ছিল তাঁর সচেতন সংবেদনশীলতা। তিনি রাষ্ট্রের শোষণনীতির বিরুদ্ধে বাঙালি তরুণদের দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু জাতিগত বিদ্বেষ তৈরি করেননি। তাই ছাত্রদের প্রতিরোধ আন্দোলনে পুলিশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আগত—লেখক যাকে বলছেন সীমান্তের ছেলে—ওসমান খানের সাহসী অবস্থান সেই সত্যকে প্রমাণ করে। অপরদিকে তৎকালীন ক্ষমতার মোহগ্রস্ত বাঙালি নেতাদের প্রতি সাধারণ জনগণের হতাশার চিত্র আছে। যেমন দেখা যায় একুশের স্মৃতিরোমন্থনে মুনিমের আত্মীয়-অধ্যাপকের মন্তব্যে: 'নেতারা কেউ ছিলো না। তারা কখনই বা ছিলেন' (জহির ২০১৬: ৩৩)। বায়ান্নর একুশের রাজনৈতিক অর্জনের ওপর ভর করেই বাঙালি নেতারা ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে বিপুল জয়ের মাধ্যমে পূর্ববাংলায় প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। সেই নির্বাচনের কথাও এসেছে সালমার ভাই শাহেদের উচ্চারণে: 'যাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছিস তারা তো এখন কিছু বলছে না' (জহির ২০১৬: ৪৭)। নেতাদের প্রতি আস্থাহীনতায় ছাত্রসমাজ হয়ে ওঠে সাধারণের প্রত্যাশা ও আস্থার আশ্রয়স্থল।

ইতিহাসের এক প্রান্তকে দিয়ে জহির রায়হান উপন্যাসটি শুরু করেছিলেন—সিপাহী বিদ্রোহীদের ফাঁসির মঞ্চ ভিক্টোরিয়া পার্ক দিয়ে। উপন্যাসের শেষে যখন আন্দোলনকারী তরুণ-তরুণীদের পুলিশ ভ্যানে করে লালবাগের মাঠে আনা হয়, তখন আবার তিনি ইতিহাসে ফিরে যান: 'হলদে রোদ চিকচিক করছে লালবাগের মাঠের ওপর, যেখানে এককালে সেই একশো বছর আগে, দেশি সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল বিদেশি বেনিয়াদের বিরুদ্ধে—সেই মাঠে' (জহির ২০১৬: ৬৬)। উপন্যাসের শুরুতে ও শেষে ইতিহাসের এই বন্ধনী জহির রায়হানের উদ্দেশ্য ও অবস্থানকে স্পষ্ট করে দেয় এবং ইতিহাস ও বর্তমানের বলয়টিও পূর্ণ হয়। 'এ-উপন্যাসের পটভূমি ১৯৫৫-এর একুশে ফেব্রুয়ারি হলেও সময় ও সমাজবোধের গভীরতায় তা বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অখণ্ড অনুভবে প্রাণময়' (রফিকউল্লাহ ২০০৯: ১৮৬)। শোষক-শোষিতের সম্পর্কটি ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করায় উপন্যাসের পক্ষ-বিপক্ষের চিরায়ত ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায়। যে একুশ ছিল একটি আর্থ-রাজনৈতিক শ্রেণিস্বার্থমূলক আন্দোলন, তা-ই ইতিহাস পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে হাল আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে পরিচিহ্নিত। শ্রেণিরাজনীতি-সচেতন জহির রায়হান সেই শ্রেণিস্বার্থের স্বরূপকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। *আরেক ফাল্গুনের* গুরুত্ব এইখানে যে, এটি একুশের চেতনার বাস্তব কার্যকারণকে উন্মোচন করতে পেরেছে; এক ফাল্গুনের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়ে গেছে বহু ফাল্গুনের কথা। সেই ইঙ্গিত আছে উপন্যাসের মধ্যেই, যখন শেষ বাক্যে তারা বলে—'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।'

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে ব্যক্তি জহির রায়হানকে শনাক্ত করা আয়াসসাধ্য নয়। পঞ্চাশের দশকে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ। ফলে গোপনে এই রাজনীতি পরিচালনা করতে হয়েছে। 'অগ্রজ শহীদুল্লা কায়সারের কাজে সহযোগিতার সূত্রধরেই জহির রায়হান রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৩/৫৪ সনের দিকে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য

হন' (আফজালুল ১৯৮৬: ৬) এবং ১৯৫৫ সালে রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ হন। এরও আগে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কারাবরণ করেন। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজের সক্রিয়তার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। '১৯৪৫ সালে "ভিয়েতনাম দিবস"-এর মিছিলে জহির অংশগ্রহণ করেন। সেই মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও আহত হন। "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের মিছিলেও তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন' (সারোয়ার ১৯৮৮: ১৩)। 'বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে জহির রায়হানের অংশগ্রহণ কোন আকস্মিক বা নিছক আবেগতাড়িত ঘটনা ছিলো না। তাঁর রাজনৈতিক জীবন-প্রবাহের স্বাভাবিক গতি তাঁকে যুক্ত করেছিলো এই আন্দোলনের সঙ্গে' (শাহরিয়ার ১৯৮৬: ৮)। অর্থাৎ রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শ্রেণিচেতনা ও জাতীয়তাবোধের একটি স্পষ্ট ধারণা ও উত্তরাধিকার নিয়েই সাহিত্যসৃজনে সক্রিয় ছিলেন জহির রায়হান। যদিও সমালোচক বলছেন—'জহির রায়হানের উপন্যাস প্রকরণ-পরিচর্যায় পরিস্রুত ও পরিমার্জিত নয়, কিন্তু জীবনার্থ ও সমাজভাবনায় নিঃসন্দেহে প্রাগ্রসর এবং ইতিহাস-চেতনাসমৃদ্ধ' (বিশ্বজিৎ ২০০৯: ১২১)। তাঁর *আরেক ফাল্গুন* সেই কতগুলো সচেতন রাজনৈতিক বোধের সামষ্টিক রূপ। আরোপিত মতবাদকে আশ্রয় করে নয়; বরং ওই কালের রাজনৈতিক উত্তাপকে ধারণ করেই এই জনগোষ্ঠীর একটি উদার ও সংগ্রামী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে। একুশে ফেব্রুয়ারি বা তৎপরবর্তী বছরের ঘটনাক্রমের মধ্যে এই উপন্যাস সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং বাঙালির সংগ্রামশীল চেতনার ধারাবাহিকতাকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে।

দুই

শওকত ওসমানের *আর্তনাদ* (১৯৮৫) ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক একটি উপন্যাস। শওকত ওসমান ইতিহাসের সাহিত্যিক রূপকার হিসেবে বিদ্বৎ-মহলে সমাদৃত। ইতিহাসের কালজ্ঞান-সম্পন্ন, বিশেষত বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারার একজন বিশ্বস্ত সৃষ্টিশীল লেখক হিসেবে তিনি সুচিহ্নিত। যতীন সরকার (১৩৯৭: ৮) মন্তব্য করেন:

> শওকত ওসমান অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই জাতিকে অসুস্থ ও পশ্চাৎগামী বিকৃত ইতিহাস থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। স্বজাতির মানুষগুলোর মধ্যে সুস্থ ইতিহাসবোধ সঞ্চার করাই তাঁর লেখনী চালনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

শওকত ওসমান এই উপন্যাসে ইতিহাসকে আশ্রয় করলেও ব্যক্তি ও সমাজ-সংকট রূপায়ণে সচেষ্ট। প্রকরণের দিক থেকেও নিরীক্ষাপ্রবণ থেকেছেন। উপন্যাসের শুরু একজন ভাষা আন্দোলনে শহিদের পিতার অব্যক্ত আর্তনাদের মধ্য দিয়ে। 'কোরাস' নামক এই অংশে একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঘটে যাওয়া রক্তাক্ত অধ্যায়ের উন্মোচন ঘটেছে একজন সন্তানহারা পিতার হাহাকারের মধ্য দিয়ে: 'কি দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলী করে মারল? কি দোষ—কি দোষ করেছিল সে?' (শওকত ১৯৯৫: ১৪)—এই প্রশ্ন, নৈঃশব্দ্য ও দীর্ঘশ্বাস বাঙালির জাতিসত্তার আর্তনাদের সমান্তরালে উপস্থিত। আর তার রূপায়ণে ঔপন্যাসিক পরিপার্শ্বের যে থমথমে ও পিনপতন নীরব পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, তাতে ওই কালের একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ে সামাজিক ও ব্যক্তিক অবস্থানটি প্রথমেই চিহ্নিত হয়ে যায়।

অন্যান্য বাসযাত্রী, চাষি, ড্রাইভার যেভাবে একাত্মতা প্রকাশ করে এই পিতার আর্তনাদের প্রতি, তাতে ভাষা আন্দোলনে সামূহিক অংশগ্রহণ ও সম্মতির একটি চিত্র তৈরি হয়: 'জোড়া জোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে। দমকে দমকে সিংহ-গর্জন এখনই ফেটে পড়বে। সকলের গলার শিরা কেঁপে কেঁপে উঠছে। দমকে দমকে' (শওকত ১৯৯৫: ১৫)। 'ভাষা আন্দোলনের চেতনাবাহী এই উপন্যাসে সমাজের মাত্রা এবং ব্যক্তির মাত্রাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক' (রফিকউল্লাহ ২০০৯: ৩৫৫)। শওকত ওসমানের রাজনীতিসচেতনতা সম্পর্কে আরো উল্লেখ্য:

> শওকত ওসমান আমৃত্যু শোষক ও শোষণের বিপক্ষে এবং নিম্নবর্গের পক্ষে এক প্রতিবাদী সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁর উপন্যাসচিন্তায় সর্বদাই জ্বলজ্বল করে উপনিবেশবাদবিরোধী রাজনীতির এক শক্তিমান আলো। (সৈয়দ আজিজুল ২০১৭: ৪)

ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের রাজনৈতিক বোধ যেমন মীমাংসিত, তেমনি এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর অবস্থানও অনেকখানি মীমাংসিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলি জাফর একজন কেরানি। তার শ্রেণি-অবস্থান নিম্নমধ্যবিত্ত, সে কৃষকপুত্র। পিতার দরিদ্র অবস্থা থেকে উন্নতির জন্য সে শহরে এসে লজিং থেকে পড়াশোনা করে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য পড়াশোনা শেষ না করেই কেরানির চাকরিতে প্রবেশ করে। কিন্তু কলেজে পড়ার সময়ে সালামত আলির মতো প্রগতিশীল মতাদর্শের শিক্ষকের সাক্ষাৎ-লাভ জাফরের জীবনবোধে প্রভাব বিস্তার করে। জাফর আরো দেখা পায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শিক্ষক নগীবউদ্দীনের। উত্তম পুরুষ তথা আলি জাফরের বয়ানে তার দুই শিক্ষকের কথোপকথন, কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে দুই জনের রাজনৈতিক অবস্থান, শ্রেণি-অবস্থান এবং তাদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের অবস্থান স্পষ্ট হয়। এখানে চরিত্রের দ্বন্দ্বগুলো যতটা না ব্যক্তিক, তার চেয়ে বেশি সামাজিক। রাজনৈতিক বিষয়গুলোও সামাজিক সংকটের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত ১৯৪৭-এর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত মূলধারার যে বয়ান ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তারই ঔপন্যাসিক রূপায়ণ ঘটেছে আর্তনাদে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে রিফিউজি ক্যাম্প, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, ট্রেনে প্রথম শ্রেণিতে ওঠা নিয়ে বাঙালি ও অবাঙালির বাক্-বিতণ্ডা ইত্যাদি। শব্দগতভাবে 'রিফিউজি' নিয়ে ঔপন্যাসিকের কিছু স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ আছে। শওকত ওসমান ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা থেকেও এই বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কথক আলি জাফরের বয়ানেই তা তুলে ধরা হয়েছে:

> 'রিফিউজি' শব্দ পূর্বে শুনেছিলাম। তখন চোখে দেখতে পেলাম তার প্রকৃত অর্থ পরিচয়। ওরা মানুষ। নিজেদের আবাস ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, তাই ত্যাগ করে এসেছে তারা নতুন আবাস রচনায় এবং এখানে জোরজবরদস্তি নেই কিছু। সবাই এসেছে নিজেদের অধিকারে। ... আরো অন্য এক নাম ছিল তা অর্থহীন। ওদের বলা হোত 'বিহারী'। অথচ সকলে বিহার প্রদেশ আগত নয়। কেউ এসেছে উত্তর প্রদেশ থেকে কেউ উড়িষ্যা বা অন্য কোন ভারতীয় প্রদেশ থেকে। কিন্তু ওদের নামকরণ হয় এজমালী এক শব্দে বিহারী। (শওকত ১৯৯৫: ১৭)

উপন্যাসের চরিত্রগুলো ভাষা আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। যেমন, একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদদের মধ্যে একজন অন্তত কেরানি পেশাভুক্ত ছিলেন—শফিউর রহমান—হাইকোর্টের কেরানি। আলি জাফরও কেরানি। কিন্তু এই কেরানি কোনো অসচেতন কেরানি নয়। তার মৃত্যুও দৈবাৎ নয়। ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে তার সঙ্গে সালামতের মতো প্রগতিশীল অংশের পরিচয় ঘটান এবং তাকে শিক্ষিত কিন্তু কৃষকপুত্র হিসেবে নির্মাণ করেন। এবং উপন্যাসের শুরুতে যেভাবে সেই পিতার হাহাকার নিনাদিত হয়, তাতে পুরো পূর্ববাংলার কেন্দ্র থেকে প্রান্ত পর্যন্ত—সকল স্তরে যে ভাষা আন্দোলনের অভিঘাত পৌঁছেছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবার যখন আলি জাফরের বয়ানে পাওয়া যায়: 'মুসলিম লীগের পতাকাবাহী আমি কিশোর কাল থেকে' তখন চেতনাগত রূপান্তরের প্রক্রিয়াটিও যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। এই জাফরের উচ্চারণেই পাওয়া যায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক ভিত্তি:

> ইংরেজরা এদেশে এসে একটু গুছিয়ে ওঠার পরই তাদের প্রথম কাজ হোলো রাষ্ট্রভাষা ফারসি তুলে দিয়ে ইংরেজিকে পাকাপোক্ত করা। তার ফল ত দেখছেন। আমরা অর্থাৎ মুসলমানরা ইংরেজী শিখিনি হিন্দুরা শিখেছে, তাই চাকরিবাকরি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অগ্রসর। (শওকত ১৯৯৫: ২৭)

এমন উচ্চারণই শোনা গিয়েছিল একসময়ের পাকিস্তান-আন্দোলনের অন্যতম রাজনীতিসচেতন বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের অন্যতম তাত্ত্বিক আবুল মনসুর আহমদের (১৯৪৭: সতের) লেখায়:

> উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী চাকরির 'অযোগ্য' বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী কাজে 'অযোগ্য' করিয়াছিলেন।

এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে সাধারণ বাংলাভাষী মানুষের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপন্যাসবিধৃত কলেজের অধ্যাপক সালামত তৎকালীন সময়ের প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২), রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) প্রমুখ যেমন ওই সংগ্রামক্ষুব্ধ বন্ধুর সময়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন—সালামতের কর্তব্যজ্ঞান, সহনশীলতা, সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত। আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দেখতে চাওয়ার পক্ষেও কিছু বাঙালি বুদ্ধিজীবী ছিলেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার তৎপরতায়ও সহমত জানিয়েছিলেন কেউ কেউ। তাঁদের যুক্তি ছিল পাকিস্তানের মধ্যে কোনোরূপ দ্বিমত তৈরি না করা। নগীবউদ্দীন সেইসব রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে। *আর্তনাদ* উপন্যাসে ভাষা আন্দোলন যে মুখ্য বিষয়, তা উপন্যাসের শুরু থেকেই স্পষ্ট। 'একটি বিশেষ ঘটনার সঙ্গে তিনি [ঔপন্যাসিক] নির্বিশেষে মিলিয়ে দিয়েছেন ইতিহাসের অকথিত অনেক ঘটনা' (বিশ্বজিৎ ২০০৯: ৩২২)। 'কোরসে'র পর 'একাকী' অংশে চরিত্রের স্বগতোক্তি হলেও তাতে রয়েছে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। সেখানে বাংলা ভাষাকে জননীসম করে একটি পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে:

> এত রক্ত, এত রক্ত ছিল এ শরীরে জননী বাংলা ভাষা? চেতনার দিগন্ত ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসার পূর্বে এই খানে মাটির উপর, জননী, তোমার বর্ণমালার ফুলঝুরিগুলো একে একে জ্বালিয়ে দাও যেন নবযুগের ভীষ্ম আমি, আমার উপর আলোক-শরশয্যার আয়োজন শুরু হয় এবং তেমনই আকাশ-মুখী শয়ান আমি অগণন নক্ষত্ররাজির বেহায়া প্রতিযোগিতা দেখতে চাই, যদিও আমার বক্ষ স্পন্দন নীহারিকার স্পন্দনের কাছে ক্রমশ পরাজিত। (শওকত ১৯৯৫: ১৬)

এই উপন্যাসে নিম্নবর্গের চোখ দিয়ে একুশকে দেখার চেষ্টা থাকলেও তা মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণে সমর্পিত; তবে এই দেখার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। উপন্যাসের শেষে ঔপন্যাসিক বিরামচিহ্নহীন কয়েক পৃষ্ঠার বাক্যবিন্যাস পাঠককে এক অস্থৈর্যময় মানসপ্রবণতা ও কালচেতনার সঙ্গে পরিচিতি ঘটায়। '*আর্তনাদ* (১৯৮৫) উপন্যাসে শওকত ওসমান ভাষা আন্দোলনের চেতনাবীজকে বাঙালি জাতিসত্তার মৌল আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত করে উপস্থাপন করেছেন' (রফিকউল্লাহ ২০০৯: ৩০৩)। সামূহিক সংকটকে ব্যক্তির সংকটের মধ্য দিয়ে এখানে উপস্থাপন করা হয়নি; তবে ব্যক্তির সংকট বহুদূর পর্যন্ত যেতে চেয়েছে। এই বিবেচনায় *আর্তনাদ* উপন্যাসকে ভাষা আন্দোলনের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সাহিত্যকর্ম বলা যায়।

বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার সমান্তরালেই পঠিত হয় শওকত ওসমানের উপন্যাস। *আর্তনাদ* উপন্যাসটিও সেই পাঠেরই অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম নেওয়া শওকত ওসমানের শৈশব-কৈশোর-শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের প্রারম্ভপর্ব কাটে পশ্চিমবঙ্গে। '১৯৪০-এর দশকের গোড়া থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চায় শওকত ওসমান ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ' (অনীক ২০১৪: ১১)। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগজনিত বাস্তবতায় তিনি তৎকালীন পূর্ববাংলায় আসেন চাকরির সূত্র ধরে—চট্টগ্রাম সিটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে। '১৯৪৭ সালে শওকত ওসমান যখন কলকাতা ছেড়ে চট্টগ্রামে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন, তখনই তাঁর পরিবারের সদস্যদের সেখানে নিয়ে আসেননি। নিজের চাকরি ও পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনি ছিলেন সন্দিহান। ... এই পারিবারিক উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ শওকত ওসমানকে অনেক সময়ই স্পষ্ট কথা বলতে দেয়নি' (কুদরত ২০১৩: ৫০)। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি একজন সচেতন নাগরিক। একুশের প্রথম সংকলন হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী*তে 'মৌন নয়' শীর্ষক তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু উপন্যাস রচনার বিষয়ে তিনি অনেক সময় বিচিত্র কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। যেমন আইয়ুবি স্বৈরশাসনের আমলে তাঁকে রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে লিখতে হয় *ক্রীতদাসের হাসি*।

আর্তনাদ উপন্যাসটি মূলত বর্ণনাধর্মী। ভাষা আন্দোলন নিয়ে জানা কথাগুলোই উপন্যাসের আঙ্গিকে রূপদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরিচিত বয়ানের রূপায়ণ সত্ত্বেও রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায় থেকে শিক্ষিত হয়ে ওঠার অভিযাত্রায় উক্ত কালপর্বের বিচিত্র পক্ষ-বিপক্ষের সঙ্গে উপন্যাসের মূল চরিত্র আলি জাফরের সাক্ষাৎ ও সম্পৃক্তি। এর মধ্য দিয়ে একজন নিরীহ বাঙালি শিক্ষিত যুবক কেরানি অস্তিত্বের প্রয়োজনে তার পক্ষ ও অবস্থান বুঝে নিতে সক্ষম হয়েছে। ফলাফল হিসেবে

তাকে একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। এর আরেকটি দিক—আলি জাফরের মৃত্যুর পর তার পিতার অর্থাৎ একজন ভাষাশহিদের দরিদ্র বৃদ্ধ পিতার আর্তনাদের সঙ্গে অপরাপর শ্রমজীবী মানুষের একাত্মতার রূপায়ণ, অর্থনৈতিক বিন্যাসে যারা নিম্নশ্রেণিভুক্ত। ঔপন্যাসিকের অভিপ্রায় একুশের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবোধের ধারণা বায়ান্নর অব্যবহিত পরে যেভাবে সর্বব্যাপী হয়েছিল, তাকে উপন্যাসে ধারণ করা, একুশের চেতনার সামূহিকতা ও সামষ্টিকতাকে চিহ্নিত করা।

তিন

সেলিনা হোসেনের *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি* (১৯৮৫) ভাষা আন্দোলনের উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। যদিও উপন্যাসটিকে দুই পর্বে ভাগ করে ফেলা যায় সহজে। প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদ বিপ্লবী সোমেন চন্দকে (১৯২০-১৯৪২) নিয়ে বলয়িত। শেষ ছয়টি পরিচ্ছেদ মুনীর চৌধুরীকে কেন্দ্র করে রূপায়িত। সোমেন চন্দের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনে তরুণ মুনীর চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন। এক সোমেন চন্দের মৃত্যু হয়, কিন্তু সেই সূত্রটি ছিন্ন হয় না; বরং মুনীর চৌধুরী সংগ্রামী জীবনের সেই 'রিলে রেস'কে জীবন্ত করে রাখেন। সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক চেনা মানুষগুলোকে উপন্যাসের চরিত্র করে তুলেছেন। 'বাঙালির স্বাতন্ত্র্যকামী সংগ্রামী চেতনা, যে চেতনার অন্তর্মূলে ছিল ত্যাগ, অসাম্প্রদায়িকতা ও সৌহার্দের মানবিক প্রেরণা। জাতিসত্তার সেই মর্মবাণীই সেলিনা হোসেন অনুসন্ধান করেছেন নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি উপন্যাসে' (সিরাজাম ২০১৮: ১০০)। ইতিহাসের বয়ানকে ঔপন্যাসিক চরিত্রের কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মুনীর চৌধুরীর সাংগঠনিক কর্মক্রিয়া, ব্যক্তিগত ত্যাগ, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রভৃতি শিল্পী মুনীর চৌধুরী ও কর্মী মুনীর চৌধুরীর মধ্যে মেলবন্ধন স্থাপন করেছে। ভাষা আন্দোলন যে একক বিষয়নির্ভর কোনো আন্দোলন নয়, বরং অনেক মাত্রার কর্মক্রিয়ার মিলিত ফল এবং এর আবেদন তখনই ফুরিয়ে যায়নি, তা নামকরণের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে মুনীর চৌধুরী কেবল এখানে ব্যক্তি নয়—সমষ্টির প্রতিনিধি। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের নির্বিচার গুলি ও হত্যার প্রতিবাদে ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে প্রতিবাদ-সমাবেশ হয়, সেখানে অন্যান্যদের সঙ্গে মুনীর চৌধুরীও বক্তৃতা দেন। সেই 'অপরাধে' ২৬ তারিখ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। উপন্যাসের শেষের দিকে উপন্যাসের ভেতর ঢুকে যায় 'কবর' নাটকও। আরেক রাজবন্দি রণেশ দাশগুপ্তের কাছ থেকে মুনীরের কাছে আসে গোপন চিঠি, যাতে বলা হয়—'নাটক লিখতে হবে'। ঔপন্যাসিক এই আপাত ছোট বিষয়টিকে তাঁর নিজস্ব বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় জারিত করে মহাজাগতিক বিষয় হিসেবে রূপদান করেন:

> ক'টি মাত্র কথা, কিন্তু কি তার শক্তি। কি তার তেজ। শরীরের প্রতি রোমকূপ দাঁড়িয়ে যায়। যেন মহাকালের আহ্বান, মুনীর এখনই সময়, উঠে দাঁড়াও, চেতনাকে শানিত করো। স্মৃতি অমর করে রাখো। (সেলিনা ২০১৬: ১৭০)

আর এরপরই মুনীর যেন ব্যক্তি-মুনীর থাকে না; পরিণত হয় রাজনৈতিক দায়বদ্ধ এক ঐতিহাসিক চরিত্রে। তাঁর সংগ্রাম হয়ে যায় মহাকালের চলমান সংগ্রামের অংশ:

> জেলের ঘণ্টায় এগারোটা বাজলো। ঢং ঢং শব্দটা অন্য রকম হয়ে যায়, যেন গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল থেকে বক্তৃতা করছে শহীদুল্লা কায়সার। সেই কণ্ঠে যেন ঐ ঢং ঢং শব্দের মতো বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটায়। ভেসে ওঠে হাসান হাফিজুর রহমানের মুখ। সবার মাঝে লিফলেট বিলি করছে। অল্পক্ষণের মধ্যে নিজ উদ্যোগে, আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ছাপিয়ে এনেছে লিফলেট। বিলি হচ্ছে শত শত লিফলেট। মুনীর দেখতে পায় হালকা মেঘের মতো উড়ে উড়ে হাজার লিফলেট ছড়িয়ে যাচ্ছে শহরে-বন্দরে, গ্রামে, গঞ্জে, মাঠে-ঘাটে, প্রান্তরে। ছেয়ে যাচ্ছে সবুজ পত্রালি, ভরে উঠেছে শস্যময় ভূমি, নদী তলদেশে। ছুটে আসছে মানুষ-মানুষ। না, এসব দিয়ে নাটক হবে না। সবই বড় বেশি বুকের কাছাকাছি। তক্ষুনি মনে হয় শহীদদের কথা, যাদের সঙ্গে এখন মুনীরের ব্যবধান অনেক। যারা ইতিহাসে অমর হয়েছে, সেই কালজয়ী নক্ষত্র বুকের নিচে জ্বলজ্বল করে ওঠে। কাগজ টেনে লিখতে বসে ও। (সেলিনা ২০১৬: ১৭১)

এরপর 'কবর' নাটকের অংশবিশেষের উল্লেখ। শেষ কয়েকটি বাক্যে সেলিনা হোসেন জানান:

> এখনো শেষ হয়নি নাটক, মুনীর লিখছে, আর অল্প বাকি। বাহান্নের একুশের পটভূমিতে রচিত হচ্ছে নাটক। জেলখানার ঘণ্টা ঢং-ঢং করে জানিয়ে যায় সময়। থেমে থেমে ঘণ্টা বাজে। লেখা থামে না, কলমে এখন জাদুর প্রদীপের ঘষা, একটা শিল্পিত দৈত্য বেরুচ্ছে। রচিত হচ্ছে মুনীরের 'কবর'। (সেলিনা ২০১৬: ১৭৫)

ইতিহাস বার বার ফিরে আসে নতুন নতুন রূপে, ভিন্ন চারিত্র্যে। সংগ্রামী চেতনার ক্ষেত্রে বলা যায়, এই চেতনা কখনো থেমে যায় না। একুশের চেতনার মধ্যে যে এক অফুরন্ত সংগ্রামী শক্তি সঞ্জীবিত থাকে, *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনির* এই অনিঃশেষ দ্যোতনা তারই পরিচয় বহন করে।

চার

সেলিনা হোসেনের আরো কয়েকটি উপন্যাসে ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ এসেছে—*যাপিত জীবন* (১৯৮১), *গায়ত্রী সন্ধ্যা* (প্রথম খণ্ড ১৯৯৪)। *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনিতে* যে নিরীক্ষা-প্রবণতা ছিল, অন্য উপন্যাসগুলোতে তা অনুপস্থিত; অন্তত ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে। *যাপিত জীবনের* কাহিনির কাল-পরিসর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২। সাতচল্লিশের 'দেশভাগ'জনিত বাস্তবতায় দেশবদলের ফলাফল স্বরূপ সোহরাব আলীর পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর থেকে ঢাকার বংশালে বদলকৃত বাড়িতে থিতু হতে হয়। বহরমপুরে পেশায় বোটানির শিক্ষক হলেও ঢাকায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসাই তার পেশা হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক ও মানসিকভাবে এটি এক ধরনের অবনমন ও আত্মকুণ্ডলায়ন। তিন পুত্র মারুফ, জাফর ও দীপুও নতুন শহর ও নতুন ভূগোলের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। দেশভাগজনিত সংগ্রাম শেষে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয় তারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সূত্রে জাফর প্রত্যক্ষ করে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে'র আন্দোলন, সংগ্রাম ও তৎপরতা। উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে আছে ইতিহাসের দালিলিক উপস্থাপনা। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকা জাফর আর তার প্রেমিকা আঞ্জুমকে নবতর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত করে। ভাষা আন্দোলনের উত্তুঙ্গ পর্যায় উপন্যাসেরও উত্তুঙ্গ পর্যায়। কারারুদ্ধ হয় আঞ্জুম। আর জেলেই জানতে পায় তার প্রেমিক জাফর পুলিশের গুলিতে নিহত—শহিদ। অপরাপর উপন্যাসের মতো এখানেও

ঔপন্যাসিকের শিল্পীসত্তার চেয়েও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বেশি ক্রিয়াশীল। এই প্রবণতাকে সমালোচকরা ইতিবাচক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। যেমন, রফিকউল্লাহ খান (২০২০: ১১৩) মনে করেন:

> জাতীয় ইতিহাসের একটা মহৎ অধ্যায়কে উপন্যাসে প্রতিফলিত করতে গেলে সেখানে শুধু একজন শিল্পীর পর্যায়ে থাকেন না, হয়ে ওঠেন সমাজতাত্ত্বিক, রাজনীতিজ্ঞ ও ইতিহাসবিদ। এ-উপন্যাস পড়ে মনে হলো বাংলাদেশের কথাসাহিত্য তার কৈশোরক উচ্ছলতাকে অতিক্রম করে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। অন্তত স্বাধীনতা-উত্তর এক দশক আমাদের উপন্যাস সমাজতাত্ত্বিক অর্থে পুরোপুরি সফলকাম না হলেও জীবনের বিচিত্র আঙিনায় প্রবেশের অধিকার অর্জনে যে অনেকখানি সক্ষম হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যাপিত জীবন উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের করণকৌশলের চেয়েও সক্রিয় ইতিহাস পাঠের বর্ণনা। ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত বক্তব্যগুলোই উপন্যাসের চরিত্ররা উচ্চারণ করে। সেলিনা হোসেন যে পূর্বপ্রকল্পিত বক্তব্যই উচ্চারণ করবেন, তাঁর নির্মিত প্রতিটি চরিত্র সে বিষয়ে সচেতন। যেমন, ১৯৪৮ সালে কাজী মোতাহার হোসেনের 'রাষ্ট্রভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা-সমস্যা' শীর্ষক (প্রথম প্রকাশ: সওগাত ১৯৪৭) প্রবন্ধের প্রসঙ্গ উপন্যাসে আছে। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, 'বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশীদিন চাপা থাকে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে।' এই প্রবন্ধ পড়ে আলোড়িত হয় জাফর। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়—'সত্যি কি তেমন দিন আসবে যেদিন পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে? ভাষাভিত্তিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে? প্রবন্ধের এ কটি পঙ্‌ক্তি জাফরের মগজে গেঁথে থাকে। ও নানাভাবে বিশ্লেষণ করে। একবার মনে হয় সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়াই উচিত। তেমন ঘটনা ঘটলে বাঙালির অহংকারের সীমা থাকবে না' (সেলিনা ২০০৯: ৫১)। ১৯৪৮-এ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শত নিপীড়ন সত্ত্বেও এ ধরনের ভাবনা ভাবার কোনো পরিস্থিতির ইতিহাসসম্মত প্রমাণ নেই। এটি লেখকের উচ্ছ্বাসমূলক উচ্চারণ। কয়েক বাক্য পরে যখন জাফর তার বাবা সোহরাবকে বলে, 'তবে তিনিও [কাজী মোতাহার] কিন্তু বাবা পঁচিশ বছর এগিয়ে কথা বলেছেন' (সেলিনা ২০০৯: ৫২), তখন স্পষ্ট হয়ে যায় লেখক সেলিনা হোসেন সেই কাল থেকে পঁচিশ বছর পর স্বাধীন বাংলাদেশকে দেখেছেন বলেই চরিত্রের মুখে সেই কথা জুড়ে দিতে পেরেছিলেন। এরূপ আরো কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বলেই সেলিনা হোসেনের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলোকে স্বতন্ত্র বিবেচনায় পাঠ করতে হয়।

পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে পূর্ববাংলার রাজনীতির পরিমণ্ডলে প্রবেশ ঘটে জাফরের কাছে থাকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' এই পুস্তিকার সঙ্গে পরিচয় করানোর মধ্য দিয়ে। জাফর বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া ছাত্র, সচেতন নাগরিক। সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর থেকে উন্মূলিত হয়ে ঢাকায় এসে তার বাবা সোহরাব আলিকে অভিযোজন-জনিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হলেও জাফরের রাজনীতি-সম্পৃক্ততা এই পুস্তিকা পাঠ দিয়ে শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে শুরুতেই ধারণা পাওয়া যায়। রাষ্ট্রভাষা

আন্দোলন ওই কালে শিক্ষিত তরুণদের নিঃসন্দেহে আলোড়িত করেছিল। জাফর তাদের একজন। কিন্তু জাফরের সার্বিক কর্মকাণ্ডে তাঁর এই রাজনীতি-সচেতনতার পেছনে অন্য কোনো আর্থ-সামাজিক সংকট প্রত্যক্ষ করা যায় না। কেবল ভাষার প্রশ্নেই সে সরব। যেমন, ফজলুল হক মুসলিম হলের সভায় উপস্থিত জাফর বক্তাদের কথা শুনে বিরক্ত বোধ করে। কারণ 'বক্তারা সবাই বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার দাবি জানায়। মেজাজ খিঁচে যায় ওর। পূর্ব পাকিস্তানের কেন? পাকিস্তানের নয় কেন? কিসের হীনমন্যতা? চাইবার সাহস না থাকলে কেউ পাতে তুলে দেবে?' (সেলিনা ২০০৯: ৫৪)। এর মধ্যে ঔপন্যাসিকের জাতীয়তাবাদী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এভাবে উপন্যাসে বিবৃত হয় শিক্ষাসম্মেলনে গৃহীত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর প্রস্তাব, এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিবাদী বক্তৃতা, বিশেষত মুনীর চৌধুরীর বক্তৃতা। এছাড়াও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব, হামিদুল হক, নুরুল আমীন, খাজা নাজিমুদ্দিন, ফজলুর রহমান, মাওলানা আকরম খাঁ, লিয়াকত আলি খান প্রমুখ ব্যক্তি, ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন স্লোগানের প্রসঙ্গ প্রভৃতির প্রামাণিক বর্ণনা আছে। ১৯৪৮-এ ১১ই মার্চের ধর্মঘট, দমনপীড়ন-গ্রেফতার, আপস-চুক্তি, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন, ভাষাপ্রশ্নে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-অজিত গুহর অবস্থান ও বিবৃতি, বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের উদ্যোগ ও এর বিরোধিতা, ১৯৫০-এর দাঙ্গা, ১৯৫১-এর দুর্ভিক্ষ, লবণ নীতি—ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনাক্রম উপন্যাসেও সহজ বিবরণে উল্লেখিত আছে। এইসব ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলো উজ্জীবিত করতে তৎপর। যেমন জাফর তৎকালীন সংকটকে দেখেছে এভাবে:

> জাফরও নিজের মধ্যে জোরালো শক্তির তেজ দেখে। যে কারণে ও অবিচল থেকে বুক পেতে দিতে পারে, যেন সমস্যাটা ওর জন্মজন্মান্তরের, আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। এর জন্যে ওর পূর্বপুরুষও মূল্য দিয়েছে, নির্যাতন সয়েছে। ভাষার প্রশ্নে আপস নেই। দেশের প্রশ্নে আপস নেই। (সেলিনা ২০০৯: ৬০)

এখানে দেশের ধারণা স্পষ্ট হয়নি। জাফর বাংলাদেশের ইতিহাসের বয়ানের সমান্তরালিত। জাফর এই উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকে এবং সে মীমাংসিত। সে শুরু থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী। তাই সে বলতে পারে:

> ভেবে দেখ ওরা কি বুঝবে চর্যাপদের ভাষা? বুঝবে কি আবদুল হাকিম কত গভীর স্বরে মাতৃভাষার প্রতি তার প্রেম উচ্চারণ করেছে? ওরা কি বুঝবে আলাওলের কাব্য? বুঝবে কি বাংলা নববর্ষ আমাদের জীবনের কতখানি? বৈশাখি মেলা না হলে আমাদের গ্রামে কোনো উৎসব জমে না? (সেলিনা ২০০৯: ৬১)

কিন্তু সোহরাবের আত্মকুণ্ডলায়নের সংকটটিই উপন্যাসকে খানিকটা হলেও দ্বন্দ্বমুখর ও জীবনজিজ্ঞাসায়িত করে। তার মতো স্ত্রী আফসানা খাতুনও আত্মকুণ্ডলায়িত। সেজন্য দেখা যায় সে নিজের সঙ্গে কথা বলে। দুই প্রজন্মের মধ্য দিয়ে দুই সংকটকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সোহরাব তার ভিটেমাটি শেকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে হয়েছে আত্মকুণ্ডলায়িত।

উপন্যাসের বয়ানে কিছু সামাজিক চিত্র আছে; যেমন নারী যাত্রীর রিকশাকে চারপাশ শাড়ি দিয়ে ঘেরাও করে থাকা। জাফর নতুন দেশে এসে নতুন সংকটকে নিজের সংকট বলেই জেনেছে। এক সাক্ষাৎকারে সেলিনা জানান, 'জাফর চরিত্র আমি বরকতের প্রতীকী চরিত্র হিসেবে রেখেছি' (হারুন ২০২৩: ৫৪০)। জাফরের মধ্যে এই দেশে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। সে মা আফসানাকে যেমন বলে, 'বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষের ভিটে আমার এই দেশ। নিজের দাবি নিয়ে থাকি, কারো তোয়াক্কা করি না' (সেলিনা ২০০৯: ১৩৩), অন্য দিকে সোহরাব-আফসানার সময় কাটে স্মৃতি রোমন্থনে। তাদের কাছে তাদের চারপাশ, গাছপালার মতোই হিন্দু গৃহকর্মী দম্পতি হরেণ-মালতী আপনজন। হরেণ ভিন্নধর্মাবলম্বী হলেও নিজ দেশে পরবাসী; সোহরাব তো পরবাসীই। তৈরি হয় মানসিক ঐক্যের জায়গা। শাসকগোষ্ঠীর কাছে দুই পক্ষই দুর্বল। কবুতরের বকম-বকম শব্দে 'কখনো মনে হয় ঐ শব্দ ট্রেনের ঝমঝম, আমনুরা থেকে একদল উদ্বাস্তু নিয়ে ছুটে আসছে। তার মধ্যে একটি পরিবার নতুন মাটিতে শেকড় ছড়িয়ে দিয়েছে, তাদের স্বপ্নগুলো ফুটে উঠছে' (সেলিনা ২০০৯: ৩৪)। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত বাড়ি বদল করতে পারা একটি মধ্যবিত্ত পরিবার নতুন শহরে এসে কীভাবে অভিযোজিত হচ্ছে, তাদের অর্থনৈতিক বিন্যাসটি কেমন, তার একটি চিত্র সোহরাব পরিবারকে দেখে বোঝা যেতে পারে:

> সোহরাব আলির বড় ছেলে মারুফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছে। যা বেতন পায় তাতে সংসার ভালোই চলে। মাঝখানে জাফর, ও ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে মাস্টার ডিগ্রি ফার্স্ট পার্ট। ছোট দীপু। আরমানীটোলা স্কুলে যায়। (সেলিনা ২০০৯: ১৮)

১৯৫২-তে এসে কনিষ্ঠপুত্র দীপুও বড় হয়ে ওঠে। সে যোগ দেয় একুশের মিছিলে। দীপুও আহত হয়। একুশের আত্মদানকারী ভাই জাফরকে হারিয়েও সে মিছিলে অংশ গ্রহণ করে:

> সে মিছিলের দিকে তাকিয়ে আঞ্জুম কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে জাফর নেই। ও জানে, যে বিন্দুতে মিছিল শুরু, সে বিন্দুতেই জাফরের অবস্থান। ও বিড়বিড় করে, তোমাকে আমি কিছুতেই মরতে দেবো না মিছিল [জাফর]। আমি কোনোদিন মা হলে সে সন্তানের নাম রাখবো জাফর। (সেলিনা ২০০৯: ১৫৯)

উপন্যাসের পরিণতি বিয়োগাত্মক হলেও রোমান্টিক। এখানে রাজনীতির স্বরূপও রোমান্টিক মাত্রা পেয়েছে। সাতচল্লিশ-পরবর্তী অপরাপর আর্থ-রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা কেবল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘটনাক্রমে এসে মিলেছে। উপন্যাসের নিজস্ব কোনো বয়ান বা ভাষ্য তৈরি হয়নি; ইতিহাসের ঘটনাই উপন্যাসের ঘটনা হয়ে উঠেছে।

অনুধাবন করা যায়, বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে সমকালকে যুক্ত করা খুব সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু যে একুশের চেতনা পুরো দুই দশক জুড়ে পূর্ববাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীকে বৃহত্তর সংগ্রামী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, উপন্যাসের মতো বড় সাহিত্য-ফর্ম তাকে ধারণ করার সাহস দেখায়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম এবং উজ্জ্বল ব্যতিক্রম জহির রায়হান। জহির রায়হান তাঁর *আরেক ফাল্গুনে* কেবল ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ এনেছেন বলেই নন্দিত হবেন না। শিল্পীর দায় এবং ইতিহাসের দায়—এই দুইয়ের অভূতপূর্ব মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে

এখানে। একুশের চেতনাকে তিনি কেবল ভাষা-চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, একে যুক্ত করেছেন বাঙালি জনগোষ্ঠীর ধারাবাহিক সংগ্রামী অভিযাত্রার সঙ্গে। তাঁর সমকালের অন্যান্য সাহিত্যিকরা উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করলেও ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। যেমন শওকত ওসমানকে রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে লিখতে হলো *ক্রীতদাসের হাসি*। আর ভাষা আন্দোলন নিয়ে *আর্তনাদ* লিখতে পারলেন স্বাধীন বাংলাদেশের কাল-পরিসরে; অনেকখানি নিরাপদ প্রতিবেশে। সেখানে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ; সমাজের সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতির সংযোগ সাধনের শিল্পপ্রয়াস আছে। তবে এ কথা বলতেই হবে, লেখকের সমকালের সঙ্গে সেই প্রয়াসের সংযোগ সামান্যই। একুশে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বাস্তবতা গুরুত্ব পেয়েছে সামূহিক মাত্রা নিয়ে; কিন্তু আশির দশকের স্বৈরতন্ত্রের কালে তার অভিঘাতের তাৎপর্য পাঠকের কাছে সুবোধগম্য নয়। সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে বায়ান্নর দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার চেয়ে একাত্তর-পরবর্তী বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উপস্থিতি বেশি। এই চেতনা কখনও কখনও হয়েছে আবেগ-আক্রান্ত। উপন্যাস হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর উপন্যাসের আখ্যান অনেক ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়েছে সংবাদপত্রধর্মী বর্ণনায়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের আভ্যন্তর-দ্বন্দ্ব তীব্র নয়; চিন্তা ও উদ্দেশ্যসাধনে সরলরৈখিক। বলা যেতে পারে, ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পের সঙ্গে বোঝাপড়াটা ঠিকমতো হয়নি; তাঁর উপন্যাসে শিল্প অনেকখানি ইতিহাস-আক্রান্ত। ইতিহাসের বয়ানের বিপরীতেও কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি তাঁর উপন্যাসে। শিল্পসাফল্যে ঘাটতি থাকলেও মূলধারার ইতিহাস রক্ষায় তাঁর নিবেদন প্রশংসনীয়। এই তিন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পাঠ করে বলা যায়, একুশের সংগ্রামী চেতনাকে উপন্যাসের আধারে রূপ দেওয়া সহজ কাজ নয়। বাংলাদেশের উপন্যাসে একুশের সংগ্রামী অভিযাত্রার ইতিহাসের বয়ান নির্মাণে স্পষ্টত কিছু শিল্প-সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যায়।

সহায়কপঞ্জি

অনীক মাহমুদ (২০১৪)। *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*। ঢাকা: সুচয়নী পাবলিশার্স।

আরজুমন্দ আরা বানু (২০০৮)। *শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য: বিষয় ও প্রকরণ*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ।

কুদরত-ই-হুদা (২০১৩)। *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস: আঙ্গিক বিচার*। ঢাকা: আদর্শ।

জহির রায়হান (২০১৬)। *আরেক ফাল্গুন*। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)। *উপন্যাস রাজনৈতিক*। কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৪)। *উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব*। কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী।

রণেশ দাশগুপ্ত (২০১২)। *রণেশ দাশগুপ্ত রচনাবলি* প্রথম খণ্ড (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রফিকউল্লাহ খান (২০১১)। *আখ্যানতত্ত্ব ও চরিত্রায়ণ*। ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন।

শওকত ওসমান (১৯৯৫)। *আর্তনাদ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

শহীদ ইকবাল (২০০৩)। *রাজনৈতিক চেতনা: বাংলাদেশের উপন্যাস*। ঢাকা: সাহিত্যিকা।

সারোয়ার জাহান (১৯৮৮)। *জহির রায়হান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সিরাজাম মুনিরা (২০১৮)। *সেলিনা হোসেনের উপন্যাসে রাজনীতি*। ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.।

সেলিনা হোসেন (২০০৯)। *যাপিত জীবন*। ঢাকা: মীরা প্রকাশন।

সেলিনা হোসেন (২০১৬)। *নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

হুমায়ুন আজাদ (২০১৪)। *ভাষা-আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আফজালুল বাসার (১৯৮৬)। 'জহির রায়হান: তাঁর সাহিত্য ও অপ্রকাশিত ডায়েরী', *উত্তরাধিকার* মাঘ-চৈত্র সংখ্যা। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৪৭)। 'বাংলাই আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে', *পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা—না উর্দু?* (এম. এ. কাসেম প্রকাশিত)। ঢাকা: তমদ্দুন মজলিস।

যতীন সরকার (১৩৯৭)। 'ইতিহাসচেতন শওকত ওসমান', *নিসর্গ* শওকত ওসমান সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন (সরকার আশরাফ সম্পাদিত)। বগুড়া।

রফিকউল্লাহ খান (২০২০)। 'সেলিনা হোসেনের যাপিত জীবন', *সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি: পাঠ ও মূল্যায়ন* (চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত)। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

শাহরিয়ার কবির (১৯৮৬)। *জহির রায়হান: একুশে ফেব্রুয়ারী*। ঢাকা: ডানা প্রকাশনী।

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৭)। 'শওকত ওসমানের উপন্যাস: উপনিবেশবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক চেতনা', *শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারক বক্তৃতা*। রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সৈয়দ আজিজুল হক (২০২০)। 'নিষ্ঠুরতম কলঙ্কিত এক রাতের আখ্যান', *সেলিনা হোসেনের সাহিত্যকীর্তি: পাঠ ও মূল্যায়ন* (চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত)। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

সৈয়দ আজিজুল হক (২০২২)। 'পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিক: নবতর চেতনায় উজ্জ্বল', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* সংখ্যা ১০২-১০৩ (হারুন রশীদ সম্পাদিত)। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হারুন পাশা (২০২৩)। 'সেলিনা হোসেনের সঙ্গে আলাপচারিতা', *পাতাদের সংসার* সেলিনা হোসেন সংখ্যা, ৯ম বর্ষ ৩৪তম সংখ্যা (হারুন পাশা সম্পাদিত)। ঢাকা।